তৃতীয় অধ্যায়

লেখা পড়ি লেখা বুঝি

১ম পরিচ্ছেদ

প্রায়োগিক লেখা

৩.১.১ প্রায়োগিক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে প্রায়োগিক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

১. প্রায়োগিক লেখায় বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

২. প্রায়োগিক লেখায় ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও পছন্দের বিষয়টি ফুটে ওঠে।

৩. প্রায়োগিক লেখায় বাস্তব তথ্য উপাত্ত ফুটে ওঠে।

৩.১.২ প্রায়োগিক লেখার উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখা সম্পর্কে জেনেছি। একেক ধরনের প্রায়োগিক লেখা একেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। নিচের ছকের বাম পাশের কলামে যোগাযোগের কিছু উদ্দেশ্য দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কী ধরনের প্রায়োগিক লেখা প্রয়োজন হতে পারে, তা নিচের ছকের ডান পাশের কলামে লেখো। এরপর সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

উদ্দেশ্য	প্রায়োগিক লেখার ধরন
অনুষ্ঠানের খবর জানানো	নোটিশ বোর্ড, দাওয়াত কার্ড
প্রচার-প্রচারণা করা	ব্যানার, লিফলেট
সচেতনতা বাড়ানো	ভাষণ, নোটিশ বোর্ড
পণ্যের বিবরণ তুলে ধরা	ব্যানার, লিফলেট
পারস্পরিক যোগাযোগ করা	চিঠি

প্রায়োগিক লেখা: ভাষণ

নিচে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) একটি ভাষণ মুদ্রিত হলো। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা। ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর রচিত তিনটি বইয়ের নাম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন'। ভাষণটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সংকলন করা হয়েছে।

ভাষণের প্রেক্ষাপট: ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফল অনুযায়ী পাকিস্তানের সরকার গঠন করার কথা ছিল আওয়ামী লীগের। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৭ই মার্চের ভাষণ

শেখ মুজিবুর রহমান

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা

আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শন্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসব? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' উইথ্ড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রাধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গোরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে,

আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কোরো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে—নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়— হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে-সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব , ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

শব্দের অর্থ

আরটিসি: রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স; গোলটেবিল বৈঠক।

ইউনেস্কো: জাতিসংঘের একটি সংস্থা।

উইথ্‌ড্র: প্রত্যাহার।

ওয়াপদা: পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

জজকোর্ট: জেলা আদালত।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি: জাতীয় সংসদ।

ব্যারাক: সেনাছাউনি।

মার্শাল ল: সামরিক শাসন।

শাসনতন্ত্র: সংবিধান।

সুপ্রিমকোর্ট: সর্বোচ্চ আদালত।

সেক্রেটারিয়েট: সচিবালয়।

সেমি-গভর্নমেন্ট: আধা সরকারি।

হাইকোর্ট: উচ্চ আদালত।

৩.১.৩ পড়ে কী বুঝলাম

'৭ই মার্চের ভাষণ' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার সহপাঠীর সঙ্গে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করো, সংক্ষেপে এগুলোর উত্তর তৈরি করো এবং উপস্থাপন করো। উপস্থাপনার শেষে শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করো।

ক. এই ভাষণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা নিজের ভাষায় লেখো।

১/ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

২/প্রাপ্ত অধিকার নিশ্চিত করা।

৩/ নিজের দেশের মানুষকে রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা।

খ. বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে?

বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে সম্পূর্নরুপে প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষদেরকে পাকিস্তানি শাসন গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। তারই অনুপ্রেরণার জন্য আজ আমরা পেয়েছি আমাদের সোনার বাংলাদেশ। আজ আমরা সবাই এদেশের স্বাধীন নাগরিক।

গ. সাধারণ গদ্য রচনা থেকে ভাষণ কোন দিক থেকে আলাদা?

১/ ভাষনের বিভিন্ন অংশের সম্ভাষণ বা সম্বোধন থাকে যা সাধারণ গদ্য রচনায় থাকে না।
২/ ভাষণে শুধু চলিত ভাষার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য। গদ্য রচনায় চলিত ও সাধু উভয় ভাষারই ব্যবহার রয়েছে।
৩/ ভাষণ যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল হয়ে থাকে যা সাধারণ গদ্য রচনা থেকে আলাদা।

ঘ. কী কী উপলক্ষে ভাষণ দেওয়া হয়?

১/ সভা সমাবেশ,
২/ বিভিন্ন দিবস উদযাপন,
৩/ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান,
৪/ সামাজিক অনুষ্ঠান,
৫/ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৩.১.৪ কেন প্রায়োগিক লেখা

‘৭ই মার্চের ভাষণ’ শিরোনামের রচনাটিকে কী কী কারণে প্রায়োগিক লেখা বলা যায়?

'৭ই মার্চের ভাষণ' শিরোনামের রচনাটিকে যেসব কারণে প্রায়োগিক লেখা বলা যায়:

১.রচনাটিতে বঙ্গবন্ধু তার বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন যা প্রায়োগিক লেখার বৈশিষ্ট্য।

২.প্রায়োগিক লেখায় বাস্তব তথ্য উপাত্ত ফুটে ওঠে। '৭ই মার্চের ভাষণ' রচনাটিতেও বঙ্গবন্ধু বাস্তব তথ্য উপাত্ত ফুটিয়ে তুলেছেন।

৩.রচনাটিতে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন যা কোনো বাস্তবিক ঘটনার সার্বিক বর্ণনা।

৪.রচনাটিতে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি প্রয়োজন বা ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে যা প্রায়োগিক লেখার বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে '৭ই মার্চের ভাষণ' রচনাটিকে প্রায়োগিক লেখা বলা যেতে পারে।

ভাষণ

ভাষণ এক ধরনের বক্তৃতা। কোনো তথ্য জানানোর জন্য, কোনো বিষয় উপস্থাপনের জন্য, কিংবা জনমত গঠনের জন্য ভাষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ভাষণ লিখিত হতে পারে, তবে মুখে বলা বা পাঠ করার পরেই ভাষণ নামে চিহ্নিত হয়। যিনি ভাষণ দেন, তাঁকে বলে বক্তা। যাঁরা ভাষণ শোনেন, তাঁরা হলেন শ্রোতা। ভাষণ দেওয়ার সময়ে বক্তা সাধারণত শ্রোতাকে সম্বোধন করে থাকেন। ভাষণ এক ধরনের প্রায়োগিক রচনা।

৩.১.৫ ভাষণ তৈরি করি

দলে আলোচনা করে নিচের যে কোনো একটি বিষয়ের উপর ‘আমার বাংলা খাতা’য় ১৫০-২০০ শব্দের একটি লিখিত ভাষণ বা বক্তৃতা তৈরি করো এবং শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করো।

- যে কোনো একটি জাতীয় দিবস
- কোনো শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা
- স্কুলে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ
- রবীন্দ্র জয়ন্তী বা নজরুল জয়ন্তী

২য় পরিচ্ছেদ

বিবরণমূলক লেখা

৩.২.১ বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে বিবরণমূলক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈ

বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য:

১.বিবরণমূলক লেখাটি হয় স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট।

২.বিবরণমূলক লেখায় লেখকের একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে।

৩.বিবরণমূলক লেখায় কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, পরিস্থিতি, ঘটনা, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির বর্ণনা।

৪. বিবরণমূলক লেখায় সাধারণত রচনাভঙ্গি স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

৫. বিবরণমূলক লেখায় লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা যায়।

হা ছেন।
'প য়কটি
বই ছে।

রবীন্দ্রনাথ

হায়াৎ মামুদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন উনিশ শতকের শেষ দিকে। সেদিন ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ। নিজেই তিনি বলেছেন, 'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।' তখন ট্রাম ছিল না, বাস ছিল না, মোটরগাড়িও ছিল না। ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল। ঘোড়ায় টানত, আর ধুলো উড়ত রাস্তায়। কলকাতা শহরের বুকে তখন পাথরের চাঙ্গাড় বসেনি, পথঘাট তখনও অনেক কাঁচা ছিল। বড়ো বড়ো দালানকোঠার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত একটা দুটো পুকুর, তার জলে সূর্যের আলো পড়ত ঝিকমিক; বিকেলে অশ্বত্থের ছায়া দীর্ঘতর করে পশ্চিমে পাটে বসত সূর্য; হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের সরু সরু পাতা, পাতার শব্দ হতো ঝিরঝির। মাঝে মাঝে কোনো গলি থেকে অকস্মাৎ আওয়াজ উঠত পালকি বেহারাদের হাঁই-হুঁই, কখনো কখনো বা বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেঁইও হাঁক।

সাবেক কালের পুরনো বিরাট প্রাসাদ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের। লোকে বলত, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ৫ নম্বর আর ৬ নম্বর—মোট দুটো বাড়ি মিলিয়ে এই পারিবারের বাসস্থান। ৫ নম্বর বাড়িটি ছিল বৈঠকখানা। এ জায়গায় বাড়ির পত্তন কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলে হয়নি, হয়েছিল তাঁর পিতামহ নীলমণি ঠাকুরের আমলে—রবীন্দ্রনাথের জন্মেরও প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে। সেটাই হলো গোড়াপত্তন। তারপর ক্রমে ক্রমে পুরনো বসতবাড়ি প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নানা মহল। ঘর অসংখ্য। বহু তলায় বা বহু ছাদে ওঠানামার জন্যে নানা রকম সিঁড়ি এখানে-ওখানে। যেন এক গোলকধাঁধা সারাটা বাড়ি।

প্রিন্সের ঐশ্বর্য তখন আর কিছুই নেই তাঁর পুত্রের আমলে; ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো প্রিন্স নন, ঋষি। কিন্তু তখন সেই বিরাট প্রাসাদের বড়ো বড়ো দেউড়িতে প্রাচীনকালের স্মৃতি—ভাঙা ঢাল, বর্শা, মরচে-পড়া তলোয়ার ঝুলছে। উঠোনই তো তিন-চারটে; বাগান বড়ো বড়ো—সদর-অন্দরের আলাদা আলাদা। বাড়িভরা লোক, আগুনতি দাসদাসী, সব সময়ে হৈ হৈ গমগম করছে। তখন গ্যাসবাতি ছিল না, বিজলি বাতি আসেনি, কেরোসিনের তেলের আলোও তখন জানত না কেউ। সন্ধেবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। তখন পানির কল বসেনি—আজকাল শহরে যেমন ট্যাপ-ওয়াটার, তেমন সেদিন ছিল না; টিউবওয়েলও লোকে জানত না তখন। দুজন বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গা থেকে পানি তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। দেউড়িতে ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং ঢং।

সে এক অন্য যুগ। ঐ রকম আলো-আঁধার-ঘেরা বিরাট প্রাসাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, বড়ো হচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য কী জানো? প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়েও রাজার হালে মানুষ হননি তিনি। শৈশবে ও বাল্যে যেভাবে তাঁর দিন কেটেছে, তার তুলনায় এখন রাজপুত্রের মতো আছ তোমরা।

বহু পরে দুঃখ করে লিখেছিলেন, 'আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে—।' আসলেই তো তাই। ছেলেবেলায় বাবা-মা ভাই-বোনদের স্নেহ, আদর-যত্নই আমাদের একমাত্র সম্বল, সবচেয়ে কাম্য; অথচ এই বালক তার কিছুই পাননি। রুগ্ন মা ছেলের কোনো খোঁজ-খবরই রাখতে পারেন না। আর বাবা সর্বদাই বাইরে ঘুরে বেড়ান স্থান থেকে স্থানান্তরে, বাড়িতে আসেন যেন দুদিনের মুসাফির। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই-বোনেরাও যে যার খেয়ালে, অথচ চোদ্দ জন ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই তো কনিষ্ঠ। তাহলে কে আছে এই শিশুর? আছে বাড়ির পুরাতন দাসদাসী। আছে তিনকড়ি দাই, কিংবা শঙ্করী, কিংবা প্যারী। তাদের পায়ে পায়ে ঘুরে, স্নেহ-তিরস্কারে দিন চলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ফিকে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে বিরাট টানা বারান্দায়। সেই স্বল্পালোকে বারান্দায় পা মেলে দিয়ে বসে উরুর উপর প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে তারা আর নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে যে যার দেশের কথা বলাবলি করছে। তাদেরই পাশে এক কোণে চুপচাপ সুবোধ ছেলে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন হয়তো। রাত্রে মশারির ভিতরে শুয়ে ঘুম আসে না। তিনকড়ি দাসী গল্প বলে, রূপকথা: 'তেপান্তরের মাঠ—জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটে রয়েছে।' প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ, এপার-ওপার দেখা যায় না, ধবধবে রুপোলি চাঁদনি, রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটছে—খটাখট খটখট খটাখট।

কিন্তু এই রূপকথা শোনার সুখও ভাগ্যে সইল না শেষাবধি। বয়স একটু বাড়তেই, পাঁচ-ছ বৎসরের বালককে অন্তঃপুর ছেড়ে চলে আসতে হলো বারবাড়িতে। এখন মানুষ হতে লাগলেন চাকরবাকরদের তত্ত্বাবধানে। কী কঠোর সে জীবনযাত্রা! বড়োলোকি বিলাসিতার ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হতো না তাঁকে। একান্ত গরিবি হালে বাল্যকাল কেটেছে। গায়ে খুব অল্প কাপড় থাকত—সুতির একটি জামা, আর একটি পায়জামা। প্রচণ্ড শীতে হয়তো আরেকটি সুতির জামা যোগ হয়েছে, তবে বেশি আর কিছু নয়। বুড়ো নেয়ামত দরজি, চোখে গোল গোল চশমা, জামা গড়িয়ে দিত, কিন্তু সে জামায় পকেট থাকত না কখনো। দশ বছর বয়সের আগে মোজা পরতে পাননি তিনি। উঠতে হতো ভোরে। বেশি শীত লাগলে পায়ে পায়ে এগুতেন তোশাখানার দিকে—চাকরেরা যেখানে থাকে সেদিকে। উদ্দেশ্য, যদি একটু আগুন মেলে, সেঁকে নেওয়া যায় হাত-পাগুলো। আধো অন্ধকারে হয়তো তখন জ্যোতিদার জন্যে চিন্তে রুটি টোস্ট করছে। বড়ো ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খাস চাকর চিন্তা, 'চিন্তে' বলেই ডাকে সকলে। লোহার আংটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার ওপরে ঝাঁঝরি রেখে রুটি টোস্ট করছে সে। আর গান গাইছে গুনগুন, মধুকানের গান। পাউরুটির ওপর মাখন গলার গন্ধে সারা ঘর ভরা। জিভে জল এসে গেল, লোভাতুর দৃষ্টিতে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। কিন্তু হায়! চিন্তের কী কঠোর প্রাণ! টোস্ট-করা রুটি নিয়ে চলে গেল যথানিয়মে। তাঁর বরাতে কিছুই জুটল না। রুটিন মাফিক যে খাবার বরাদ্দ ছিল তাই খেতে হয়েছে মুখ গুঁজে। আবদার করার কেউ নেই, কান্নাকাটি করলেও হৃদয় গলবে না কারো।

রুদ্ধ জীবনের ফাঁকে বৈচিত্র্যও আসত কখনো সখনো। হয়তো শখের যাত্রা হবে বাড়িতে। যাত্রার পার্টি গেছে। 'বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রং-করা টিনের বাক্সোয়।' তবু শেষ রক্ষা হতো না। যাত্রা দেখার পূর্বেই ঘুমোতে যেতে হতো, জোর করে ধরে নিয়ে যেত কোনো চাকর।

দিন চলেছিল এভাবে, মন্থর গতিতে। পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বালক রবি ও আরো দু-এক জন তার কানের কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠত 'রাধাকৃষ্ণ'। মাইনে-করা দিনু স্যাকরা ফোঁস ফোঁস করে হাপর টানছে, উঠোনে বসে তুলো ধুনছে ধুনুরি। কানা পালোয়ান হিরা সিংয়ের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে মুকুন্দলাল দারোয়ান, চটাচট লাগাচ্ছে চাপড় দুই পায়ে, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখারির দল বসে আছে ভিখ নেবে বলে। গল্প বলছে আবদুল মাঝি দাড়ি নেড়ে নেড়ে: 'আমি ডাক দিলুম, "আও বাচ্চা।" সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আঁটকিয়ে ... ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্চাকে দিয়ে গুন টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে।'

এমনিভাবে দিন কাটে। হাতেখড়ি সবেমাত্র হয়েছে। ছড়ার রাজ্য আর পরির দেশের বন্ধ দুয়ার তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল। শ্রীকণ্ঠ বাবু ছিলেন বাড়ির বন্ধু, দিনরাত গানের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বারান্দায় বসে তিনি চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতের গুড়গুড়ি থেকে ভুর ভুর করে অম্বুরি তামাকের সুগন্ধ উঠত, গুনগুন করে গান করতেন। যখন আর আনন্দ ধরে রাখতে পারতেন না, তখন উঠে দাঁড়াতেন, নেচে নেচে বাজাতে

থাকতেন সেতার, হাস্যোজ্জ্বল চোখ বড়ো বড়ো করে গান ধরতেন—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী'। সত্যপ্রসাদের বোন ইরু—ইরাবতী, সে আবার কোনখানে 'রাজার বাড়ি' আবিষ্কার করেছিল! কেবলই গল্প করত রাজবাড়ির। সে স্যাঁতসেঁতে এঁদো কুঠরিতে বিরাট জালাগুলোয় ভরা থাকত সংবৎসরের খাবার জল, সেই ঘরে আরো যেন কাদের বাস ছিল—তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, দুটো কান ঠিক যেন কুলো আর পা দুটো উলটো দিকে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ। তারই এক ডালে এক পা, আরেক পা তেতলার কার্নিসের ওপর দিয়ে আঁধার রাতে দাঁড়িয়ে থাকত বিরাট এক ব্রহ্মদত্যি। একটা পালকি ছিল ঠাকুরমাদের আমলের। সেটা দেখতে নবাবি ছাঁদের, খুব দরাজ বহর ছিল তার। সেই পালকিই আস্তানা হতো এই বালকের। মনে হতো, পালকিটা যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর সে ছুটির দিনের রবিনসন ক্রুসো। বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বাজে; কিন্তু পালকির ভিতরের দিনটা কোনো ঘণ্টার হিসেব মানে না। তার মধ্যে বসে বসেই সময় বয়ে যায়, হাজার রকমের খেয়ালখুশি ভিড় করে মগজে। বড়ো হলে তিনি নিজেই একটা চিঠিতে লিখেছিলেন এ রকম:

> মনে আছে এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। .... গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম—ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন—বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়-বাদলা— সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।

সব শিশুরই ছেলেবেলা হয়তো এভাবেই কেটে যায়। তোমরাও তো এ রকমই করতে—রাজ্যের ধুলোমাটি-মাখা আর অসম্ভবের স্বপ্নে প্রহর কাটানো; তাই না?

কিন্তু এমনি করে দিন কেটে গেলে তো চলবে না। গুরুজনদের তত্ত্বাবধানে নিয়মমাফিক নানা প্রকার শিক্ষাভ্যাস শুরু হলো। খুব ভোরে তাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হতো, তা সে শীতকালই হোক, কি বর্ষা কিংবা গ্রীষ্ম হোক না কেন। হ্যাঁ, তারপর সেই অত ভোরে উঠেই এক কানা পালোয়ান হিরা সিংয়ের কাছে ল্যাঙোট পরে ধুলোমাটি মেখে কুস্তি লড়তে হতো। কুস্তি লড়া শেষ হতে না হতে মাইনে-করা মাস্টার মশাই চলে আসতেন ভূগোল-ইতিহাস ইত্যাদি পড়াবার জন্যে। তারপর তো স্কুল। বিকেলবেলা স্কুল থেকে মেজাজ খিঁচড়ে ফিরে এলেন। তবু কি নিস্তার আছে? ড্রয়িং মাস্টারের কাছে ছবি-আঁকা শিখতে বসলেন; আরেকটু পরে আবার কিঞ্চিৎ ব্যায়াম। বিকেলবেলা কিনা, তাই। সন্ধের পর ইংরেজি পড়া, প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। কিন্তু যেই বই হাতে-নেওয়া অমনি কোত্থেকে রাজ্যের ঘুম চলে আসত, আর বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে ঢুলতে আরম্ভ করতেন। ভাগ্যিস বড়দা প্রায়ই বারান্দা দিয়ে যেতেন ঐ সময়ে। ঢুলতে দেখে তিনি ছুটি দিয়ে দিতেন। আর যেই না ছুটি পাওয়া, অমনি সোজা অন্তঃপুরের মধ্যে মার কাছে দৌড়। তখন কোথায় ঘুম, আর কোথায়ই বা ঢুলুনি!

ছোটোবেলায় অসুখবিসুখ বড়ো একটা করত না। অসুখ তৈরি করে পড়া ফাঁকি দেওয়ার কত চেষ্টাই না করেছেন: জুতো ভিজিয়ে পায়ে দিয়ে বেড়ালেন সারা দিন, কোথায় সর্দি? কিচ্ছু হলো না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়ে আছেন, সকালে যখন উঠলেন তখন শিশিরে চুল-জামা সব ভিজে গেছে। কিন্তু হায় রে! গলার মধ্যে একটু খুশখুশ করে কাশিও হলো না। বদহজমের ফলে পেটও কামড়ায়নি কোনোদিন। যদি কামড়াত কখনো তো সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। মা যদিও বুঝতেন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যে কোন ধরনের বদহজম হয়েছে ছেলের, তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' কী আনন্দ!

এ তো গেল রোজকার রুটিন। এ ছাড়া আরো বাড়তি আছে অনেক কিছু। রোববার সকালে এক মাস্টার মশাই আসেন বিজ্ঞান শেখাতে। এই জিনিসটা বেশ ভালো লাগত বালক রবীন্দ্রনাথের। বিজ্ঞান পড়তে গেলে কত রকম কলকবজা, জিনিসপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। ঐ সব খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে সময় কাটাতে তাঁর খু-উ-ব ভালো লাগত। এ সময়েই আবার মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র আসত অস্থিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে। তার জন্যে একটা নরকঙ্কাল কিনে এনে পড়বার ঘরে টাঙিয়ে রাখা হলো। বাংলা ভাষা শিক্ষাও পুরোদমে চলেছে। সুর করে করে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' তো কবেই পড়া হয়ে গেছে। এখন মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়া শুরু হলো; এ বয়েসেই তিনি এ রকম শক্ত একটা বই পড়া শেষ করেন। তোমরা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে, এই বই এখন এসএসসি পাস করা ছেলেও পড়তে পারে না, অথবা পড়লেও বোঝে না; তিনি কিন্তু এগারো বছর পার না-হতেই এ বই পড়েছিলেন।

শব্দের অর্থ

ধুনুরি: যারা তুলা দিয়ে লেপ-তোশক তৈরি করে।

ধোনা: বিশেষ যন্ত্র দিয়ে তুলাকে আলগা করা।

নবাবি ছাঁদ: নবাবি ধরন।

পত্তন: শুরু।

পাথরের চাঙাড়: পাথরের খন্ড।

প্রশ্রয়: আশকারা।

ফরাস: ঝাড়ামোছার কাজ করে যে।

ফিকে: অনুজ্জ্বল।

ফিরিঙ্গি: ইউরোপীয় জাতি।

বয়োজ্যেষ্ঠ: বয়সে বড়ো।

বর্শা: একপ্রান্তে লোহার ফলাযুক্ত হাতিয়ার।

বাখারি: বাঁশের মোটা চটা।

বৈঠকখানা: বাড়ির বাইরের দিকে বসার ঘর।

মুগুর: মাথা মোটা এক ধরনের হাতিয়ার।

মুসাফির: অতিথি।

রুদ্ধ: বন্ধ।

শেষাবধি: শেষ পর্যন্ত।

সহিস: ঘোড়ার দেখাশোনা করে যে।

সেকেলে: পুরানো।

স্থানান্তর: অন্য স্থান।

স্বল্পালোক: অল্প আলো।

হাঁই-হুঁই: হাঁকডাক।

৩.২.২ পড়ে কী বুঝলাম

'রবীন্দ্রনাথ' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. 'প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়েও রাজার হালে মানুষ হননি তিনি।'—লেখক কী কী কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন?

নমুনা উত্তর: রবীন্দ্রনাথের মা ছোট বেলা থেকেই অসুস্থ থাকায় মায়ের আদর থেকে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত হয়েছেন। বাবা নিজের কাজের উদ্দেশ্যে বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন। ফলে বাবার স্নেহ ও তিনি সেভাবে পাননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অযত্ন ও অবহেলায় দাস-দাসীর কাছেই বড় হয়েছেন। এ সব কারণেই লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন, 'প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়েও রাজার হালে মানুষ হননি তিনি।

খ. রবীন্দ্রনাথের কোন কাজগুলো করতে ভালো লাগত এবং কেন ভালো লাগত?

নমুনা উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান পড়তে ভালোবাসতো। তিনি নতুন নতুন জিনিস জানতে পছন্দ করতেন। তিনি বিজ্ঞান পড়তে গেলে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেন এবং সময় কাটাতে পছন্দ করতেন।

গ. 'রবীন্দ্রনাথ' রচনায় বেশ কিছু বিষয়ের বিবরণ আছে। এর মধ্য থেকে যে কোনো দুটি বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

নমুনা উত্তর:
১.রবীন্দ্রনাথের সময়ের কলকাতার গাড়ি ও রাস্তার বিবরণ রয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের সময়ে কলকাতায় যোগাযোগের জন্য কোন ট্রাম ছিল না, বাস ছিল না, মোটরগাড়িও ছিল না। শুধু ঘোড়ায় টানা ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল। পথঘাট তখনও অনেক কাঁচা ছিল তাই গাড়িগুলো চলার সময় ধুলো উড়ত।
২. রবীন্দ্রনাথের সময়ের রাতের অন্ধকার দূর করার পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের সময়ে কোন গ্যাসবাতি,বিজলি বাতি বা আধুনিক কোন বাতি ছিল না। কেরোসিনের তেলের বাতিও তেমন ছিল না। তখনকার সময় সন্ধেবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত।

৩.২.৩ লেখা নিয়ে মতামত

‘রবীন্দ্রনাথ’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

‘রবীন্দ্রনাথ’ রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।	‘সেকেলে’ বলতে কোন কাল বুঝিয়েছে, সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলার কাল।
২. বাঁখাড়ি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম।	বাঁখাড়ি কথাটি দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে, সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম বাঁখাড়ি অর্থ বাঁশের ফালি।
৩. ছ্যাকড়া গাড়ি ছিল।	ছ্যাকড়া গাড়ি কি? সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম এটি হচ্ছে গরুর গাড়ি।

‘রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামের রচনাটিকে কেন বিবরণমূলক লেখা বলা যায়?

নমুনা উত্তর: একটি বিবরণমূলক লেখায় যতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার প্রায় সবগুলো "রবীন্দ্রনাথ" শিরোনামের লেখায় রয়েছে। যেমন-

১. রবীন্দ্রনাথের ছোট থেকে বেড়ে উঠার বিবরণ পাওয়া যায়।
২. রবীন্দ্রনাথের সময়ের কলকাতা কেমন ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়।
৩. তখনকার সময়ের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়।
৪. রবীন্দ্রনাথে দাদার জীবন যাপনের বিবরণ পাওয়া যায়।
৫. রবীন্দ্রনাথের পছন্দ অপছন্দের বিবরণ পাওয়া যায়।

তাই বলা যায়, "রবীন্দ্রনাথ" রচনাটি একটি বিবরণমূলক রচনা।

বিবরণমূলক লেখা

স্থান, বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী, অনুভূতি, ঘটনা বা কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয় যে রচনায়, তাকে বিবরণমূলক লেখা বলে। যে কোনো বিষয়ের উপরই বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা যায়। বিবরণমূলক লেখায় লেখকের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। সাধারণত কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিবরণটি তুলে ধরা হয়। ‘রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামের লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই বিবরণের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের বেড়ে ওঠা উপলব্ধি করা যায়। একইসঙ্গে এই লেখায় উনিশ শতকের কলকাতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

তথ্যমূলক লেখা

৩.৩.১ তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে তথ্যমূলক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে তথ্যমূলক লেখা বলা যায় তার মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো-

১.তথ্যমূলক লেখায় বিভিন্ন বিষয়ের নানা তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

২.তথ্যমূলক লেখায় শিরোনাম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে হয়।

৩.তথ্যমূলক লেখার মধ্যে ছবি, ছক, সারণি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

নিচে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা একটি তথ্যমূলক রচনা দেওয়া হলো।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) বিখ্যাত ভাষাবিদ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ ডিগ্রি এবং প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত ও বাংলা' বিভাগে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ', 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ইত্যাদি। 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' তাঁর সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান।

ইবনে বতুতার ভ্রমণ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ইবনে বতুতা মরক্কোর তানজাহ শহরে ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে হজের উদ্দেশ্যে তিনি জন্মভূমি থেকে রওনা হন। ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহরগুলি ভ্রমণ করে শেষে তিনি মিসরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে মক্কা শরিফে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। সেই দেশের রাজা তখন মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। ইবনে বতুতা সেজন্য সেখানে কোনো জাহাজ না পেয়ে পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন। সেখান থেকে তিনি সিরিয়া যান। দামেস্কে গিয়ে হাদিসের বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে দুজন বিদুষী রমণীও ছিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে গত বছরের হজের সংকল্প পূরণের জন্য প্রথমত মদিনা শরিফে উপস্থিত হন। পরে মক্কা শরিফে গিয়ে হজ সম্পন্ন করেন।

হজ শেষ করে তিনি ইরানি কাফেলার সাথে ইরাকে পৌঁছান। নাজাফ আশরাফ দেখার জন্য বাগদাদে যান। সেখান থেকে ওয়াসেত, ওয়াসেত থেকে রওয়াকে সৈয়দ আহমদ রেফায়ির কবর জিয়ারত করেন। সেখান থেকে বশরা এবং বশরা থেকে তিনি ইরানের সারহাদে পৌঁছেন। কিছুদিন শুশতারে অবস্থান করে ইস্পাহান হয়ে শিরাজ নগরে উপস্থিত হন। সেখানে সুফি শেখ আবু আবদুল্লাহ খফিফ এবং বিখ্যাত নীতিকার শেখ সাদির

কবর দর্শন করেন। সেখান থেকে গায়রুন বন্দর হয়ে পুনরায় ইরাকে উপস্থিত হয়ে কুফায় পৌঁছান। সেখান থেকে দ্বিতীয়বার বাগদাদে আসেন। ধ্বংস হয়ে গেলেও তখন বাগদাদ বড়ো শহর ছিল। বাগদাদ থেকে মসুল এবং মারভিন হয়ে ইবনে বতুতা দ্বিতীয় হজের জন্য ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা শরিফে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি দুই বছর থাকেন। পরে চতুর্থ বার হজ করে জেদ্দায় যান।

মানচিত্রে লাল রঙের রেখায় ইবনে বতুতার ভ্রমণপথ চিহ্নিত করা হয়েছে

জেদ্দা থেকে জাহাজে উঠে লোহিত সাগরের অপর তীরে আফ্রিকা ভ্রমণ করে ইয়েমেন আসেন। পরে এডেন থেকে জাহাজে চড়ে আফ্রিকার পূর্ব তীরে পৌঁছান। সেখান থেকে জাঞ্জিবার ও উঞ্জুজা ভ্রমণ করে জাহাজ যোগে আরবের দক্ষিণ ভাগে হাজরামাউতের জাফর শহরে আসেন। সেখানে থেকে ওমান হয়ে হরমুজ শহরে উপস্থিত হন। সেখানে বিখ্যাত দাতা বাদশাহ তহন্তনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে তিনি আনাতোলিয়ায় চলে যান। তখন আনাতোলিয়ায় অরাজক ছিল। বুরসা থেকে জাহাজে চড়ে কৃষ্ণসাগরের তীরে তীরে শহর দেখতে দেখতে কাজাখ মরুভূমিতে উপস্থিত হন। পরে ছয় মাসের রাস্তা অতিক্রম করে ক্রিমিয়ায় পৌঁছান। তখন ক্রিমিয়া সুলতান উজবুকের রাজত্বাধীন ছিল। এই রাজা চেঙ্গিস খাঁর বংশসম্ভূত ছিলেন। রাশিয়ার অধিকাংশ তাঁর পদানত ছিল। ভলগা নদীর তীরস্থ সরায় তাঁর রাজধানী ছিল।

সেখান থেকে ইবনে বতুতা বুলগার দেশে যান। রাশিয়ার উত্তরাংশকে এই নামে অভিহিত করা হতো। তখন রমজান মাস ছিল এবং দিন বাড়ার ঋতু ছিল। রোজা খুলে মাগরিব ও এশার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়তে না

পড়তে সকাল হতো। সেখান থেকে উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল। ঈদের দিন পর্যন্ত তিনি বাদশাহ শিবিরে রইলেন। যখন তিনি বাদশার সঙ্গে হাজী তুরখান শহরে ছিলেন, তখন বাদশার এক বেগম যিনি কুসতুনতিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজার কন্যা ছিলেন, কুসতুনতিনিয়া যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইবনে বতুতা তাঁর সাথে কুসতুনতিনিয়ায় গিয়ে পুনরায় সরায় শহরে ফিরে এলেন।

সেখান থেকে বোখারায় পৌঁছালেন। সেখানে চেঙ্গিস খাঁর বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন তরমশিয়ারিনের দরবারে কিছুদিন থেকে সমরখন্দে চলে যান। সেখান থেকে বাল্খ, বাল্খ থেকে হিরাত, সেখান থেকে জাম, মশহদ ও নয়শাবুর ভ্রমণ করে কুন্দুস দিয়ে আন্দরাব ও পাঞ্জশির রাস্তা দিয়ে পাশাই ও পারোয়ান হয়ে গজনি ও চরখে পৌঁছালেন। সেখান থেকে কাবুলে গেলেন। কাবুল থেকে কির্মাশ হয়ে সম্ভবত কুরাম পাস দিয়ে সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ এবং কাশ্মীর এলাকা দিয়ে মরুভূমির পথে সিন্ধুর তীরবর্তী ভক্করের নিকট কোনো স্থানে ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইবনে বতুতা উপস্থিত হলেন।

পরে ভক্কর হয়ে সিন্ধুর মোহনাস্থিত বন্দর লাহিরীতে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে মুলতানে এলেন। মুলতান থেকে যাত্রা করে অযোধ্যা অর্থাৎ পাকপট্টনের ঘাট পার হয়ে শতদ্রু অতিক্রম করলেন। সেখানে থেকে পুরাতন দিল্লিতে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাঁকে বিশেষ সম্মান করে শহরের কাজি নিযুক্ত করলেন। ইবনে বতুতা নয় বছর পর্যন্ত দিল্লিতে থাকেন।

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি চীনরাজের নিকট বাদশাহর দূতরূপে উপহার দ্রব্য নিয়ে যেতে নিযুক্ত হন। দিল্লিতে অবস্থানকালে তিনি কনৌজ, আমরোহা ও বিজনোর ভ্রমণ করেছিলেন। এখন দিল্লি থেকে তালপাত, বিয়ানা, কোইল, কনৌজ, গোয়ালিয়র, চন্দেরী ও ধার হয়ে উজ্জয়িনী পৌঁছালেন। সেখান থেকে দৌলতাবাদ এলেন। দৌলতাবাদ থেকে ফিরে সাগরতীরে পৌঁছে সেখান থেকে খাম্বায়েতে উপস্থিত হলেন। বাহারুচের নিকটবর্তী কন্ধার বন্দরে জাহাজে সওয়ার হয়ে ঘোঘা, গোয়া ও হানুর হয়ে মালাবারে পৌঁছালেন।

পরে মালাবারের বন্দর হয়ে কালিকটে উপস্থিত হলেন। সেখানে জাহাজ ভেঙে গেল। জাহাজের সমস্ত লোক ও বাদশাহর উপহার দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে ইবনে বতুতা তখন জাহাজে ছিলেন না, তাই বেঁচে গেলেন। বাদশাহর ভয়ে ইবনে বতুতা দিল্লি ফিরে না গিয়ে হানুরের সুলতান জামালুদ্দিনের দরবারে উপস্থিত হলেন। হানুর থেকে ফিরে শালিয়াতে এলেন। সেখান থেকে জাহাজে করে ১৩৪৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মালদ্বীপে উপস্থিত হলেন।

ঠিক এক বছর পরে ইবনে বতুতা মালদ্বীপ হতে রওনা হয়ে সিংহলে পৌঁছালেন। সেখানে রাজার সঙ্গে বাতালাবাত্তা নগরে সাক্ষাৎ করে এবং বাবা আদমের পদচিহ্ন জিয়ারত করে মবরে (কর্ণাটক রাজ্যে) উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর শ্বশুর সৈয়দ জলালুদ্দিন আহমদ বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তুঘলক থেকে বিদ্রোহী হয়ে মাদুরাই রাজত্ব করছিলেন। তিনি ইবনে বতুতার আগমনের পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। ইবনে বতুতা সেখান থেকে কোলাম চলে এলেন। সেখানে তিনি তিন মাস থাকলেন। সেখান থেকে হানুর যাত্রা করার উদ্দেশে তিনি জাহাজে যাচ্ছিলেন, পথে জলদস্যুগণ তাঁর জাহাজ লুট করে নেয়। অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে তাঁর স্মারকলিপিও অপহৃত হয়। এজন্য ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে মধ্যে মধ্যে কিছু গোলযোগ দেখা যায়। ইবনে বতুতা কালিকটে ফিরে এলেন। সেখান থেকে পুনরায় মালদ্বীপে উপস্থিত হলেন।

সেখান থেকে জাহাজে রওনা হওয়ার ৪৩ দিন পরে বাংলাদেশের সপ্তগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হলেন। পরে নদীপথে

কামরূপে গিয়ে শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। ১৩৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন।

সোনারগাঁ থেকে একটা চীনা জাহাজে চড়ে ইবনে বতুতা আরাকান ও পেগুর তীর দিয়ে সুমাত্রায় উপস্থিত হন। তখন সেখানে মালিক জাহির রাজা ছিলেন। সুমাত্রা থেকে মূল জাভা পৌঁছান। মূল জাভা সম্ভবত শ্যাম, কম্বোডিয়া ও কোচিন। সেখান থেকে চীন দেশে গিয়ে কিছু দিন সেখানে পরিভ্রমণ করে পুনরায় সুমাত্রায় উপস্থিত হন।

সেখানে দুই মাস থেকে জাহাজে রওনা হন এবং ৪০ দিন পরে কোলাম পৌঁছান। সেখানে তিনি রমজান মাস কাটিয়ে ঈদের নামাজ পড়েন। ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরবের জাফর শহরে উপস্থিত হন। পরে মাসকাট, শিরাজ, ইয়াজদ, ইস্পাহান ও শুশতার হয়ে এবং বশরা ও কুফা ভ্রমণ করে ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাগদাদে পৌঁছালেন। সেখান থেকে সিরিয়া ঘুরে মিসর, তুনিস, সার্ডনিয়া ও স্পেন হয়ে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মরক্কোর রাজধানী ফেজ শহরে উপস্থিত হলেন। এভাবে ২৫ বছর বিদেশ ভ্রমণের পরে ইবনে বতুতা স্বদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশে ফিরেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। তিনি সুদান ভ্রমণে বের হন। ভ্রমণ শেষ করে ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বাড়ি পৌঁছালেন। তিনি মোট ২৮ বছরে ৯৫ হাজার মাইল পথ পর্যটন করেন। তিনি ১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে মারা যান। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনার কাজ শেষ করেছিলেন।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

উদ্যোগ: প্রস্তুতি।

তীরস্থ: তীরবর্তী।

পদানত: পরাজিত।

বংশোদ্ভূত: বংশে জন্ম নেওয়া।

বিদুষী: বিদ্বান (নারীবাচক)।

বৃত্তান্ত: বিবরণ।

সওয়ার: আরোহী।

স্মারকলিপি: সম্মিলিত আবেদনপত্র।

এই রচনায় ব্যবহৃত স্থাননাম

আফগানিস্তান: আন্দরাব, কুন্দুস, কুরাম পাস, গজনি, চরখ,পাঞ্জশির, পারোয়ান, পাশাই, হিরাত।

আফ্রিকা: আলেকজান্দ্রিয়া, উঞ্জুজা, ক্রিমিয়া, জাঞ্জিবার, তানজাহ, তুনিস, ফেজ, মরক্কো, মশহদ, মিশর।

আরব দেশ: ইয়ামেন, এডেন, ওমান, জাফর, জেদ্দা, দামেস্ক, মদিনা, মাসকাট, সিরিয়া, হাজরামাউত।

ইউরোপ: বুলগার, সরায়, সার্ডনিয়া, স্পেন, হাজী তুরখান।

ইন্দোনেশিয়া: সুমাত্রা।

ইরাক: ওয়াসেত, কির্মাশ, কুফা, নাজাফ আশরাফ, বশরা, বাগদাদ, মারভিন, রওয়াক।

ইরান: ইয়াজদ, ইস্পাহান, গায়রুন, নয়শাবুর, শিরাজ, শুশতার, হরমুজ।

উজবেকিস্তান: বোখারা।

কাজাখাস্তান: কাজাখ।

তুরস্ক: আনাতোলিয়ায়, বুরসা।

ভারত: অযোধ্যা, আমরোহা, উজ্জয়িনী, কনৌজ, কন্ধার, কামরূপ, কালিকট, কাশ্মীর, কোইল, কোলাম, গোয়া, গোয়ালিয়র, ঘোঘা, চন্দেরী, তালপাত, দৌলতাবাদ, পাকপট্টন, বাহারুচ, বিজনোর, বিয়ানা, মাদুরাই, মালাবার, মুলতান, লাহিরী, শালিয়াত, সপ্তগ্রাম, হানুর।

মায়ানমার: পেগু।

৩.৩.২ পড়ে কী বুঝলাম

'ইবনে বতুতার ভ্রমণ' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. এই রচনায় ইবনে বতুতাকে কী ধরনের ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে?

ক) এই রচনায় ইবনে বতুতাকে কী ধরনের ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে?

উত্তর: এই রচনায় ইবনে বতুতাকে একজন ভ্রমণ পিপাসু ব্যাক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ. 'কিন্তু দেশে ফিরেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি।'—কী কারণে ইবনে বতুতা স্থির থাকতে পারেননি বলে মনে করো?

উত্তর: ইবনে বতুতা একজন ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেও যেন তার ভ্রমণের তৃষ্ণা মেটাতে পারেননি। ভ্রমণ ছিল তার নেশা, ধ্যান ও জ্ঞান। আর তাই তিনি নতুন নতুন দেশ ভ্রমণ ছাড়া থাকতে পারতেন না।

গ. দেশে কিংবা দেশের বাইরে ভ্রমণের ব্যাপারে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা বা মতামত থাকলে তা উল্লেখ করো।

উত্তর: আমি গত জানুয়ারি তে আমাদের দেশের রাঙ্গামাটির সাজেক ভ্রমন করছিলাম। সাজেক ভ্রমণ ছিল আমার জন্য একটা অসাধারণ অনুভূতি। রাঙ্গামাটি জেলার সর্বউত্তরের মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত সাজেক ভ্যালি। এর অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তুলনাহীন। এখানে যাওয়ার পথ দুর্গম। সুন্দর মসৃণ আঁকা বাঁকা সরু রাস্তা,আকাশছোঁয়া পাহাড়, মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে গভীর খাদ, বহু নীচ দিয়ে বয়ে চলা সরু নদী। সাজেক ভ্যালীতে সবচেয়ে অসাধারণ মুহূর্ত হচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে মেঘ ধরতে পারা। সাজেক ভ্যালী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এক মনোমুগ্ধকর ঘটনা হয়ে থাকবে।

৩.৩.৩ লেখা নিয়ে মতামত

‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. ইবনে বতুতা মরক্কোর তানজাহ শহরে ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।	মরক্কো কোথায়, তা মানচিত্রে দেখতে হবে।
২. নাজাফ আশরাফ দেখার জন্য বাগদাদে যান।	নাজাফ কোথায়, তা মানচিত্রে দেখতে হবে।
৩. ১৩৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন।	তিনি কতদিন বাংলায় অবস্থান করে ছিলেন। ইবনে বতুতার ইতিহাস সম্পর্কে

৩.৩.৪ কেন তথ্যমূলক লেখা

‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ শিরোনামের রচনাটিকে কেন তথ্যমূলক লেখা বলা যায়?

নমুনা উত্তর:

ইবনে বতুতার ভ্রমণ' শিরোনামের রচনাটি লেখায় ইবনে বতুতা ও তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। রচনাটিতে একটি সুন্দর শিরোনাম রয়েছে। এই ভ্রমণ রচনায় ইবনে বতুতার ভ্রমণের বিভিন্ন দেশ ও স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। রচনাটিতে তথ্যকে স্পষ্ট করার জন্য এখানে মানচিত্র দেওয়া হয়েছে, তাই রচনাটিকে তথ্যমূলক লেখা বলা যায়।

তথ্যমূলক লেখা

যেসব রচনায় তথ্য পরিবেশন করা হয়, সেগুলোকে তথ্যমূলক লেখা বলে। এ ধরনের লেখায় তথ্য পরিবেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। বইপত্র পড়ে, অনলাইনের মাধ্যমে কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য উপস্থাপনের সময়ে জানা তথ্যও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে মিলিয়ে নিতে হয়। ‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ রচনায় একজন পর্যটকের ভ্রমণপথ সম্পর্কে খানিক ধারণা পাওয়া যায়। এই ভ্রমণপথের সূত্রে অনেক অজানা স্থাননামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণমূলক লেখা

৩.৪.১ বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য:

১.বিশ্লেষণমূলক লেখায় বর্ণনা, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষিত হয়।

২.বিশ্লেষণমূলক লেখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তথ্য-উপাত্ত।

৩.তথ্যপূর্ণ বা উপাত্তনির্ভর লেখা বিশ্লেষণের সময় ব্যক্তিগত মতামত পরিহার করতে হয়।

৪.এ ধরনের লেখায় যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হয়।

৫.এ ধরনের লেখায় বিভিন্ন তথ্যের মধ্যকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, সম্পর্ক, তুলনা ইত্যাদি প্রকাশ করা যায়।

বই 'লাল নীল দীপাবলী'। তাঁর লেখা ভাষাবিজ্ঞানের বই 'বাক্যতত্ত্ব', 'তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান'।

শব্দ থেকে কবিতা

হুমায়ুন আজাদ

কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। যে লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।

কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ঘুড়ি বানাতে চায়। ঘুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ—রংবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'নদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও? চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নূপুরের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানা রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সেসব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয়; কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নূপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাংলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠালচাঁপার ঘ্রাণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানা রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই

তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানা রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সবসময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানখেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো: আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সেসব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম:

দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে: চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ তিনটি পঙ্‌ক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরো এগিয়ে গিয়ে লিখলাম:

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর। এ নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। 'গোলাপ ফুলের মুখের রূপ' বলার সাথে সাথে

ফুল একটি মুখের মতো ফুটে উঠল, মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পারো। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোটো, এ ছোটো থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোটো সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছোটো আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

তোমরা এখন ছোটো, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে। যত পার, দেখো। দেখো, দেখো এবং দেখো। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড়ো হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোটো বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোটো বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোটো বয়সে বুকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড়ো হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

কাঁঠালচাঁপা: একটি ফুলের নাম।

চমকপ্রদ: যা অবাক করে দেয়।

ছন্দ: কবিতার তাল।

পঙ্‌ক্তি : লাইন।

ভাব: অনুভূতি।

৩.৪.২ পড়ে কী বুঝলাম

'শব্দ থেকে কবিতা' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. কবিতার বিষয় সম্পর্কে লেখকের ভাবনা কী? তোমার চারপাশে এমন কী কী বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে কবিতা লেখা যেতে পারে?

উত্তর: কবিতার বিষয় সম্পর্কে লেখকের ভাবনা হলো-
যেকোনো বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। তাঁর মতে- বাড়ির পাশের গলি, দূরের ধানখেত, পোষা বিড়াল, পতুল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যায়।
আমার চারপাশে এমন অনেক বিষয় আছে, যা নিয়ে কবিতা লেখা যায়। যেমন- পাহাড়, মেঘ, নদী, বাড়ির পাশের আম গাছ ইত্যাদি।

খ. 'কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক।'—লেখক এ কথা দিয়ে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: কবিতা লেখার উপযুক্ত উপকরণ এবং মনে থাকা স্বপ্নের সমন্বয়ে কবিতা লেখার কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য লেখক আলোচ্য বাক্যে বুঝাতে চেয়েছেন।

গ. কবিতা পড়তে ভালো লাগে কেন?

উত্তর: কবিতা পড়তে ভালো লাগার কারণ:
কবিতা ছন্দে ছন্দে পড়া যায়। কবিতায় লেখা থাকে মানুষের মনের কথা। একজন কবি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন তার লেখার মাধ্যমে তাই কবিতা পড়তে ভালো লাগে।

৩.৪.৩ লেখা নিয়ে মতামত

‘শব্দ থেকে কবিতা’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

‘শব্দ থেকে কবিতা’ রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. যে লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা।	গল্প পড়লেও আমার মন খুশিতে নেচে ওঠে। কিন্তু সেটা কবিতা নয়।
২. তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।	শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলেই কি কবিতা লিখতে পারবো?
৩. কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন।	কবিরা কী শুধু কবিতা লিখেন। কবিরা কী গান, গল্প লিখতে পারেন না?

৩.৪.৪ এটি কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা

‘শব্দ থেকে কবিতা’ শিরোনামের রচনাটিকে কেন বিশ্লেষণমূলক লেখা বলা যায়?

নমুনা উত্তর: শব্দ থেকে কবিতা লেখাটিতে কবিতা এবং কবিতা লেখা বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখাটিতে লেখকের নিজের বোধগম্যতা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এ রচনায় লেখক কবিতা লেখার পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে কবিতা রচনা করতে হয়। তাই শব্দ থেকে কবিতা' শিরোনামের রচনাটিকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলা যায়।

বিশ্লেষণমূলক লেখা

বিবরণমূলক লেখায় কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনার বিবরণ থাকে। আর তথ্যমূলক লেখায় কোনো বিষয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে বিবরণ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করা হয় যেসব রচনায়, তাকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে। ‘শব্দ থেকে কবিতা’ রচনায় লেখক কবিতা লেখার পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে কবিতা রচনা করতে হয়।

৫ম পরিচ্ছেদ

কল্পনানির্ভর লেখা

৩.৫.১ কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য

যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো লেখাকে কল্পনানির্ভর লেখা বলা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লেখো। লেখার পরে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

৩.৫.১ কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য

১.কল্পনানির্ভর লেখায় অনেক ঘটনার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল থাকে না।

২.কল্পনানির্ভর লেখা পড়তে ভালো লাগে এবং মানুষেরা লেখাগুলো পড়ে কল্পনার জগতে বিচরণ করে।

৩.কল্পনানির্ভর লেখায় অনেক কাল্পনিক চরিত্র থাকে যেগুলো বাস্তবে দেখা যায় না।

৪.কল্পনানির্ভর লেখায় বিভিন্ন অবাস্তব ধারণা বর্ণনা করা থাকে।

৫.কল্পনানির্ভর লেখায় বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তুকে মানুষের মতো ও অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেগুলো মানুষের মতো আচরণ করে, কথা বলে, আলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

'কালিদাসের মেঘদূত' ইত্যাদি।

কোকিল

হ্যান্স অ্যান্ডারসন

অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু

শোনো তবে।

চীনদেশের রাজা একজন চীনেম্যান, তাঁর আগে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে যত লোক, তারাও সব চীনে। রাজার ছিল এক প্রাসাদ, অমন আর পৃথিবীতে হয় না। বাগানে ফোটে কত আশ্চর্য ফুল; সবচেয়ে যেগুলো দামি তাদের গলায় রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, কাছ দিয়ে যদি হেঁটে যাও, ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাতেই হবে। বুঝলে, রাজার বাগানে সব ব্যবস্থাই চমৎকার। এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়। যদি কেবলই হেঁটে চলো, আসবে এক বনের ধারে। কী সুন্দর বন, তাতে মস্ত উঁচু গাছ আর গভীর হ্রদ। বন সোজা সমুদ্রে চলে গেছে, নীল জলের অতল সমুদ্র আর ঝুঁকে-পড়া ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কোকিল। কী মধুর তার গান, এত মধুর যে জেলে মাছ ধরতে এসে হাতের কাজ ফেলে চুপ করে শোনে, যখন শেষ রাতে জাল ফেলতে আসে সে শোনে কোকিলের স্বর।

নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে সেই রাজধানীতে, দেখে বাহবা দেয়। রাজার প্রাসাদ আর বাগান দেখে তাদের চোখের পলক আর পড়ে না; কিন্তু কোকিলের গান যেই তারা শোনে, অমনি বলে ওঠে, 'আহা, এমন আর হয় না!'

দেশে ফিরে এসে তারা কোকিলের গল্প করে; পণ্ডিতেরা বড়ো বড়ো পুথি লেখেন চীন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, বাগান নিয়ে; কিন্তু কোকিলকে কি তাঁরা ভুলতে পারেন? সেই পাখির প্রশংসা হাজার পাতা জুড়ে, আর কবিরা হ্রদে-ঘেরা বনের বুকের সেই আশ্চর্য পাখিকে নিয়ে আশ্চর্য সব কবিতা লেখেন।

পুথিগুলো পৃথিবীতে কে না পড়ল! আর চীন রাজার হাতেও কয়েকখানা এসে পড়ল বইকি। তাঁর সোনার সিংহাসনে বসে বসে তিনি পড়লেন, আরও পড়লেন, পড়তে পড়তে কেবলি খুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন— কেবল তাঁর রাজধানীর, তাঁর প্রাসাদের, তাঁর বাগানের এত সব উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে বড়ো ভালো লাগল তাঁর। 'কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোকিল পাখি', সেখানে স্পষ্ট করে লেখা।

রাজা চমকে উঠলেন। 'কোকিল! সে কী জিনিস? ও রকম কোনো পাখি আছে নাকি আমার রাজত্বে? আমার বাগানেও নাকি আছে! আমি তো কখনো শুনিনি! কী কাণ্ড, তার কথা আমি প্রথম জানলাম এসব বই পড়ে। রাজা তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এতই প্রধান যে তাঁর নিম্নস্থ কেউ যদি কখনো সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথা বলত তিনি শুধু জবাব দিতেন: 'পিঁ!' আর তার অবশ্য কোনো মানে হয় না।

'কোকিল বলে এক আশ্চর্য পাখি নাকি এখানে আছে', রাজা বললেন। 'এঁরা বলছেন আমার এত বড়ো রাজত্বে সেটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস। কই, আমি তো তার কথা কখনো শুনিনি!'

প্রধান অমাত্য একটু ভেবে বললেন, 'রাজসভায় সে তো কখনো উপস্থিত হয়নি, তার তো নামই শুনিনি, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় সে আমার সভায় এসে গান করবে, এই আমার আদেশ। যদি সে না আসে তাহলে আজ সান্ধ্যভোজের পর আমার সমস্ত সভাসদ হাতির নিচে পড়ে মরবে।'

'চুং-পিঁ!' প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন। তারপর আবার তিনি ওঠানামা করলেন দুশো সিঁড়ি দিয়ে, খুঁজলেন সব ঘর, সব বারান্দা, আর সভাসদরা ছুটল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। হাতির নিচে পড়ে মরতে কারুরই পছন্দ নয়।

শেষটায় রান্নাঘরে ছোটো একটা মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা, রাজার পাঁচশো রাঁধুনির জন্য পাঁচশো ঝি, সেই ঝিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। সে বলল, 'কোকিল? আমি তো রোজই শুনি তার গান—আহা, সত্যি বড়ো ভালো গায়।'

প্রধান অমাত্য গম্ভীরমুখে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কোকিলের রাজসভায় আসবার কথা। তুমি পারবে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে? যদি পারো, এক্ষুনি তোমাকে রাঁধুনি করে দেব, তাছাড়া মহারাজ যখন ভোজে বসবেন তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখবার অনুমতি পাবে।'

তখন তারা সবাই মিলে গেল সেই বনে, কোকিল যেখানে গান গায়; গেল মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির, নাজির, হাকিম, পেশকার।

'ওই তো!' মেয়েটি বলল। 'শুনুন আপনারা, শুনুন—ওই তো সে বসে আছে।' মেয়েটি একটা গাছের ঘন ডালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি লাফঝাঁপ মেরে অনেক চেষ্টায় সবাই সেই কালো পাখিকে দেখতে পেল। প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন, 'আরে এ আবার একটা পাখি নাকি! মরি মরি, কী রূপ!'

সমস্ত দল এই রসিকতায় হেসে উঠল।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলল, 'কোকিল, শুনছ? আমাদের সম্রাট তোমার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' কোকিল তক্ষুনি মহা উৎসাহে গান গাইতে আরম্ভ করল।

কোকিল ভেবেছিল সম্রাট বুঝি সেখানে উপস্থিত। প্রধান অমাত্য গম্ভীরস্বরে বললেন, 'বেশ গান তোমার, কোকিল। আজ রাজপ্রাসাদের সান্ধ্য-উৎসবে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি, সেখানে তুমি গান শুনিয়ে আমাদের সম্রাটকে মুগ্ধ করবে।'

রাজসভায় আজ উৎসব-সজ্জা।

সভার ঠিক মাঝখানে সোনার একটা ডালে হীরের পাতা বসানো, কোকিল সেখানে বসবে।

সভাসদরা বসেছেন সাজের আর অলংকারের ঝিলিক তুলে, আর সেই ছোটো মেয়েটি দরজার আড়ালে—সে এখন রাজ-রাঁধুনির পদ পেয়েছে। সবাই কোকিলের দিকে তাকিয়ে; স্বয়ং সম্রাট চোখের ইশারায় তাকে

উৎসাহ দিচ্ছেন।

আর কোকিল এমন আশ্চর্য গান করল যে সম্রাটের দুচোখ জলে ভরে উঠল, চোখ ছাপিয়ে বেয়ে পড়ল গাল দিয়ে; তখন কোকিল গাইল আরও মধুর, আরও তীব্র মধুর স্বরে, তা সোজা বুকের মধ্যে এসে লাগল। সম্রাট এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে তাঁর একপাটি সোনার চটি গলায় পরবার জন্যে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোকিল বলল, 'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কিছু নিতে পারব না, যথেষ্ট পুরস্কার আমি পেয়েছি। আমি সম্রাটের চোখে অশ্রু দেখেছি—সেই তো আমার পরম ঐশ্বর্য। সম্রাটের অশ্রুর অদ্ভুত ক্ষমতা—এত বড়ো পুরস্কার আর কী আছে?'

তখন থেকে রাজসভাতেই তার বাসা হলো, নিজের সোনার খাঁচায়। দিনের মধ্যে দুবার সে বেরোতে পারে, আর রাত্রে একবার। আর তার বেরোবার সময় সঙ্গে থাকে বারো জন চাকর, তাদের প্রত্যেকের হাতে পাখির পায়ের সঙ্গে বাঁধা রেশমি সুতো শক্ত করে ধরা। এ রকম বেড়ানোয় কোনো সুখ নেই, সত্যি বলতে।

একদিন রাজার নামে এল মস্ত একটা পার্সেল, তার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা, 'কোকিল।'

'এই বিখ্যাত পাখি সম্বন্ধে নতুন একটা বই এল', রাজা বললেন।

কিন্তু বই তো নয়, বাক্সের মধ্যে ছোটো একটা জিনিস। চমৎকার কাজ করা একটা কলের কোকিল, মণি মুক্তো হীরে জহরতে ঝলোমলো, সত্যিকারের পাখির মতো তার গান। কলের পাখিটায় দম দিয়েছ কি সে অবিকল কোকিলের মতো গাইতে শুরু করবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দুলবে তার সোনা-রুপোর কাজ-করা লেজ। গলায় তার ছোট্ট ফিতে বাঁধা, তাতে লেখা: 'জাপানের মহামহিমান্বিত সম্রাটের কোকিলের তুলনায় চীন সম্রাটের কোকিল কিছুই নয়।'

'এখন এরা দুজন একসঙ্গে গান করুক', রাজা বললেন। 'সে কী চমৎকারই হবে!'

দুজনে একসঙ্গে গাইল, কিন্তু বেশি জমল না। কারণ কলের কোকিল গাইল বাঁধা গৎ, আর সত্যিকারের কোকিল গাইল নিজের খেয়ালে।

কোকিল-বাহক বলল, 'আমাদের কোকিলের কিছু দোষ নয়; ও বাঁধা সুরে গায়—একেবারে নিখুঁত।'

তারপর কলের কোকিল একা গাইল। আসল কোকিলেরই মতো সে মুগ্ধ করল—তার ওপর সে দেখতে অনেক ভালো, বাজুবন্ধ-হারের মতো ঝলমল করছে।

একবার নয়, দুবার নয়, বত্রিশবার কলের কোকিল সেই একই গৎ গাইল, তবু ক্লান্ত হলো না। অমাত্যদের আবার শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু সম্রাট বললেন, 'এখন জ্যান্ত কোকিল কিছু গান করুক।'

কিন্তু কোথায় সে?

কখন সে উড়ে গেছে খোলা জানালা দিয়ে, ফিরে গেছে বনের সবুজ বুকে, কেউ লক্ষ করেনি।

তারপর অবশ্য কলের কোকিলকে আবার গাইতে হলো, চৌত্রিশ বারের বার একই গৎ তারা শুনল। পরের

পূর্ণিমায় রাজ্যের সব প্রজাদের নিমন্ত্রণ হলো এই পাখি দেখতে—সংগীতবিশারদ দেখাবেন। গানও শুনতে হবে তাদের, রাজার হুকুম। গান তারা শুনল—একবার নয়, দুবার নয়, ছত্রিশ বার। এত খুশি হলো তারা গান শুনে, যেন ছত্রিশ পেয়ালা চা খেয়েছে। কেউ বলল আহা, কেউ বলল ওহো; কেউ ঘাড় নাড়ল, কেউ নাড়ল মাথা; কিন্তু সেই যে জেলে, বনের মধ্যে আসল কোকিলের গান যে শুনেছিল, সে বলল, 'মন্দ নয়, কিন্তু যতবার গাইল এক রকমই লাগল যেন। আর কী যেন একটা নেই মনে হলো।'

কথাটা সংগীতবিশরাদ শুনে ফেললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নেই বলো তো বাপু? তালে লয়ে সুরে মানে একেবারে নিখুঁত!'

জেলে বেচারা ঘাবড়ে চুপ করে গেল। আসল কোকিল নির্বাসিত হলো দেশ থেকে। নকল পাখিটা রইল রাজার হালে; সম্রাটের বিছানার পাশে রেশমি বালিশে সে ঘুমোয়, চারদিকে মণি মুক্তো হীরে জহরতের সব উপঢৌকন ছড়ানো।

সংগীতবিশারদ এই নকল পাখি সম্বন্ধে পঁচিশখানা মোটা মোটা পুথি লিখে ফেললেন—তাঁর লেখা যেমন লম্বা তেমনি গুরুগম্ভীর, চীনে ভাষার যত শক্ত শক্ত কথা সব আছে তাতে—তবু সবাই বলল যে তারা সবটা পড়েছে এবং পড়ে বুঝেছে, পাছে কেউ বোকা ভাবে, কি সংগীতবিশারদ চটে গিয়ে পাগলা হাতির নিচে তাদের থেঁতলে মারেন।

কাটল এক বছর এমনি করে। কলের পাখির গানের প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো টান সম্রাটের মুখস্থ, তাঁর পারিষদদের মুখস্থ, প্রত্যেক চীনের মুখস্থ।

এরই মধ্যে একদিন হলো কী—কলের পাখি গেয়ে চলছে, এত ভালো সে আর কখনোই যেন গায়নি—সম্রাট শুনছেন বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ পাখিটার ভেতরে একটা শব্দ হলো, গর্র্র্! কী যে একটা ছিঁড়ে গেল 'গঁ-গঁ-গর্র্র্'—সবগুলো চাকা একবার ঘুরে এল, তারপর গান গেল থেমে।

সম্রাট লাফিয়ে উঠলেন, ডেকে পাঠালেন তাঁর দেহ-পুরোহিতকে (চীন সম্রাটের চিকিৎসকের তা-ই উপাধি); কিন্তু তিনি কী করবেন? তারপর ডাকা হলো ঘড়িওয়ালাকে—অনেক বলাবলি, অনেক খোঁজাখুঁজি, টুকটাক ঠুকঠাকের পর পাখিটাকে কোনোরকম মেরামত করা গেল বটে; কিন্তু আগের জিনিস আর হলো না। ঘড়িওয়ালা বলে গেল একে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়, কলকব্জা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এরপর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গাওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গাওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

পাঁচ বছর কেটে গেল—এবার রাজ্যে সত্যিকারের হাহাকার। চীনেরা তাদের সম্রাটকে সত্যি ভালোবাসে, আর এখন শোনা যাচ্ছে সম্রাটের নাকি অসুখ, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। এরই মধ্যে নতুন একজন সম্রাট ঠিক করা হয়ে গেছে; আর প্রজারা রাজপ্রাসাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান অমাত্যর কাছে খোঁজ নিচ্ছে রাজা কেমন আছেন।

প্রধান অমাত্য বলছে, 'পিঁ!' আর মাথা নাড়ছেন।

মস্ত জমকালো বিছানায় সম্রাট শুয়ে আছেন—শরীর তাঁর ঠান্ডা, মুখ তাঁর ম্লান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন—তাঁরা ছুটেছেন নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

কিন্তু সম্রাট মরেননি; শক্ত, নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছেন জমকালো বিছানায়। ঘরের জানালা খোলা, আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সম্রাটের ওপর আর তাঁর কলের পাখির ওপর।

অতি কষ্টে সম্রাটের নিশ্বাস পড়ছে, কেউ যেন চেপে বসেছে তাঁর বুকের ওপর। চোখ মেলে তিনি তাকালেন; দেখলেন তাঁর বুকের ওপর মৃত্যু বসে, তার মাথায় তাঁরই সোনার মুকুট, এক হাতে তাঁরই তরোয়াল, অন্য হাতে তাঁরই ঝকঝকে নিশান। এখন মৃত্যু কিনা তাঁর বুকের ওপর বসে!

'গান! গান!' সম্রাট বলে উঠলেন।

কিন্তু পাখিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—কে দেবে তাকে দম, আর দম না দিয়ে দিলে সে গাইবেই বা কী করে?

আর হঠাৎ জানালার দিক থেকে বেজে উঠল গান, আশ্চর্য মধুর গান। এ সেই ছোট্ট কোকিল, আসল কোকিল, জানালার বাইরে গাছের ডালে বসে সে গাইছে। সে শুনেছিল সম্রাট ভালো নেই, আর তাই সে এসেছে তাঁকে শান্তি দিতে, আশা দিতে। গেয়ে চলল সে একমনে, রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে জোরে বইল সম্রাটের দুর্বল শরীরে; এমনকি মৃত্যুও কান পেতে শুনল, তারপর বলল: 'আহা—থেমো না, বাছা, থেমো না!'

'তবে আমাকে দাও ওই ঝকঝকে সোনালি তরোয়াল, দাও ওই চোখ-ঝলসানো নিশান, দাও ওই সম্রাটের মুকুট।'

আর মৃত্যু একে একে সব ঐশ্বর্যই দিয়ে দিল, গান শুনবে বলে। কোকিলের গান আর থামে না।

রাজা বলে উঠলেন, 'ধন্য কোকিল, তুমি ধন্য! ওরে স্বর্গের পাখি, তোকে তো আমি চিনি! তোকেই না আমি আমার রাজত্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! তবু তুই-ই তো আজ তাড়িয়ে দিলি মৃত্যুকে আমার হৃদয় থেকে! কী পুরস্কার চাস তুই বল।'

কোকিল বলল, 'আমি তো পেয়েছি আমার পুরস্কার। মহারাজ, প্রথম যেদিন আমি আপনার সামনে গান করি, আপনার চোখে জল এসেছিল। তা আমি কখনো ভুলব না। যে গান গায়, ওর বেশি আর কোন মণিমুক্তো চায় সে? এখন আপনি ঘুমোন, মহারাজ, সুস্থ সবল হয়ে উঠুন, আর আমি আপনাকে গান শোনাই।'

গাইল কোকিল, শুনতে শুনতে সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম মুছিয়ে দিল তাঁর সকল রোগ, সকল ক্লান্তি। সকালবেলার আলো জানালা দিয়ে তাঁর মুখের ওপর এসে পড়ল; তিনি জেগে উঠলেন—নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহ নিয়ে। অমাত্য কি ভৃত্য কেউ তখনও আসেনি, সবাই জানে তিনি আর বেঁচে নেই। কেবল কোকিল তখনও গান করছে তাঁর পাশে বসে।

'তুমি সবসময় থাকবে আমার সঙ্গে—থাকবে তো?' সম্রাট বললেন। 'তোমার যেমন খুশি গান করবে তুমি। কলের পুতুলটাকে হাজার টুকরো করে আমি ভেঙে ফেলব।'

কোকিল বলল, 'মহারাজ, মিছিমিছি ওর ওপর রাগ করছেন। যতখানি ওর সাধ্য ও করেছে; এতদিন ওকে রেখেছেন, এখনও রাখুন। আমি তো রাজপ্রাসাদে বাসা বেঁধে থাকতে পারব না; অনুমতি করুন, যখন ইচ্ছে করবে আমি আসব, এসে সন্ধেবেলায় জানালার ধারে ওই ডালের ওপর বসে গান শোনাব আপনাকে—সে গান শুনে অনেক কথা আপনার মনে পড়বে। যারা সুখী তাদের গান গাইব, যারা দুঃখী তাদের গান গাইব; গাইব চারদিকে লুকোনো ভালো-মন্দের গান। আপনার এই ছোটো পাখিটি অনেক দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়, গরিব জেলের ঘরে, চাষিদের খেতে—আপনার সভার ঐশ্বর্য থেকে অনেক দূরে যারা থাকে, যায় তাদের কাছে, জানে তাদের কথা। আপনাকে আমি গান শোনাব এসে; কিন্তু মহারাজ, একটি কথা আমাকে দিতে হবে।'

'যা চাও! যা কিছু চাও তুমি!' সম্রাট নিজের হাতেই তাঁর রাজবেশ পরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সোনার তরোয়াল চেপে ধরলেন বুকের ওপর।

'এই মিনতি আমার, ছোটো একটা পাখি এসে আপনাকে সব কথা বলে যায় এ কথা কাউকে বলবেন না। তাহলেই সব ভালো রকম চলবে।'

এল ভৃত্য, এল অমাত্য মৃত সম্রাটকে দেখতে। এ কী! ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে! সম্রাট তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'।

শব্দের অর্থ

অতল: যার তল নেই।

অমাত্য: মন্ত্রণাদাতা।

উজির: মন্ত্রী।

উপঢৌকন: উপহার।

ঐশ্বর্য: সম্পদ।

কলকব্জা: যন্ত্রপাতি।

গৎ: গানের নির্ধারিত সুর।

চীনেম্যান: চীন দেশের লোক।

নাজির: রাজকর্মচারী।

নিঃসাড়: অচেতন।

নির্বাসিত: বহিষ্কৃত।

পারিষদ: সভার সদস্য।

পেশকার: রাজকর্মচারী।

প্রাসাদ: রাজবাড়ি।

বাজুবন্ধ-হার: বাহুতে পরার অলংকার বিশেষ।

মহামহিমান্বিত: অতিশয় মহান।

রাজধানী: দেশ শাসনের কেন্দ্র।

সংগীতবিশারদ: সঙ্গীতজ্ঞ।

সভাসদ: সভার সদস্য।

সান্ধ্যভোজ: সন্ধ্যার খাবার।

স্বয়ং: নিজে।

হ্রদ: প্রাকৃতিক জলাশয় বিশেষ।

৩.৫.২ পড়ে কী বুঝলাম

'কোকিল' রচনার ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। তোমার একজন সহপাঠীর সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করো এবং সংক্ষেপে উত্তর তৈরি করো।

ক. আসল কোকিল আর কলের কোকিলের মধ্যে মিল-অমিল উল্লেখ করো।

মিল

১.সত্যিকারের কোকিল ও কলের কোকিল উভয়েই গান গাইতে পারে।

২.সত্যিকারের কোকিল ও কলের কোকিল উভয়েই রাজাকে গান শুনাতে পারে।

অমিল

১.সত্যিকারের কোকিল নিজ কণ্ঠে তার খেয়ালে গান গাইতে পারে আর কলের কোকিল গৎবাঁধা গান গায়।

২.সত্যিকারের কোকিল নষ্ট হয়ে যায় না আর কলের কোকিল নষ্ট হয়ে যায়।

খ. প্রধান অমাত্যকে কেমন মানুষ বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর: প্রধান অমাত্যকে একজন নির্বোধ, ভিতু ও অহংকারী মানুষ বলে আমার মনে হয়। কারণ অমাত্য কোকিলকে ব্যক্তি মনে করেছে। রাজার হাতির নিচে পড়ে মরার ভয়ে সে দুশো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে সব ঘর, বারান্দায় ঐ কোকিলকে খুঁজেছে। কোকিলের সন্ধান পেয়ে পাখি বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে।

গ. 'প্রাকৃতিক' আর 'কৃত্রিম' বলতে কী বোঝায়? প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জিনিসের ভালো-মন্দ দিকগুলো তুলে ধরো।

প্রাকৃতিক জিনিস: প্রকৃতি হতে তৈরি সকল কিছুই প্রাকৃতিক জিনিস। যেমন: মানুষ, বিভিন্ন পশু পাখি, পাহাড়, বনজঙ্গল ইত্যাদি।

কৃত্রিম জিনিস: মানুষ যা কিছু তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাই হচ্ছে কৃত্রিম জিনিস। যেমন: গাড়ি, ঘর-বাড়ি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক জিনিস:

১.প্রাকৃতিক জিনিস মানুষ তৈরি করতে পারে না। এরা প্রকৃতি থেকে তৈরি হয়।

২.প্রাকৃতিক জিনিসের জন্ম ও মৃত্যু হয়।

৩.প্রাকৃতিক জিনিসের নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি ও খেয়াল খুশি রয়েছে।

কৃত্রিম জিনিস:

১.কৃত্রিম জিনিস মানুষ তৈরি করে।

২.কৃত্রিম জিনিসের জন্ম ও মৃত্যু নেই। তবে নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়।

৩.প্রাকৃতিক জিনিসের নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

৩.৫.৩ লেখা নিয়ে মতামত

'কোকিল' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। কাজ শেষে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা দেওয়া হলো।

'কোকিল' রচনায় যা আছে	আমার জিজ্ঞাসা ও মতামত
১. এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়।	রাজার বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে।
২. মস্ত জমকালো বিছানায় সম্রাট শুয়ে আছেন শরীর তাঁর ঠান্ডা, মুখ তাঁর ম্লান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন তাঁরা ছুটেছেন নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।	সম্রাটের মৃত্যু নিশ্চিত না হয়ে শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে কেনো নতুন সম্রাটকে বরণ করা হচ্ছে? তাহলে কী এতো বড় ক্ষমতাধর সম্রাট হয়েও তার প্রতি কারো ভালোবাসা নেই।
৩. কলকব্জা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এরপর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গাওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গাওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।	কলের কোকিল যেহেতু একটি যন্ত্র এটি কোন একজন মানুষ তৈরি করেছে আর তাই তাকে দিয়ে তো আর কলের কোকিল তৈরি করা যেতো।

৩.৫.৪ এটি কেন কল্পনানির্ভর লেখা

'কোকিল' শিরোনামের রচনাটিকে কেন কল্পনানির্ভর লেখা বলা যায়?

নমুনা উত্তর: 'কোকিল' গল্পটি কল্পনানির্ভর লেখা। কেননা এর বৈশিষ্ট্যসমূহ কল্পনানির্ভর লেখার সাথে মিলে যায়। আমরা জানি, কল্পনানির্ভর লেখা বাস্তবের সাথে মিল থাকে না। এ ধরনের লেখায় থাকে কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনা কিংবা চরিত্র। 'কোকিল' গল্পটিতে এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান। এ গল্পটিতেও বাস্তবের সাথে পুরোপুরি মিল নেই। এতে অবাস্তব কিছু ব্যাপার আছে। এখানে কোকিলের গান শুনে মৃত্যুও চীন সম্রাটের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। কোকিল পাখিটি অসম্ভব মধুর সুরে গান গাইতে পারে। এ পাখিটিই এই গল্পে অবাস্তব একটি চরিত্র। কল্পনানির্ভর লেখায় বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তুকে মনুষ্য ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেগুলো মানুষের মতো আচরণ করে, কথা বলে। এ গল্পেও কোকিল মানুষের মতো কথা বলেছে। কল্পনানির্ভর লেখা সম্পূর্ণভাবে রচয়িতার কল্পনাপ্রসূত সৃজনশীল রচনা। সুতরাং এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় 'কোকিল' গল্পটি কল্পনানির্ভর গল্প।

চারপাশের যে জগৎ আমরা দেখতে পাই, তাকে বলে বাস্তব জগৎ। তথ্যমূলক বা বিশ্লেষণমূলক রচনায় বাস্তব জগতের প্রতিফলন থাকে। কিন্তু কল্পনানির্ভর রচনায় থাকে কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনা কিংবা চরিত্র। 'কোকিল' গল্পটিতে অবাস্তব কিছু ব্যাপার আছে। তাই এটি কল্পনানির্ভর রচনা।